|| শ্রীহরি ||
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

|| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 17: শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

1/2 (শ্লোক 1-13), শনিবার, 04 মে 2024

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিদুষী মাননীয়া বন্দনা বর্ণেকর মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/2rxvCKSy454

তিন প্রকারের আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান

সনাতন ধর্মের পুণ্য ঐতিহ্য অনুসরণ করে মঙ্গলাচরণ, হনুমান চালিসা পাঠ ও দীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের বিবেচন সত্রের সূচনা হয়।

মা সরস্বতীর বন্দনা, ভগবান বেদ ব্যাস জী, সাধক জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জী এবং সদগুরু শ্রী গোবিন্দদেব গিরি জী মহারাজের চরণে শত কোটি প্রণাম এবং উপস্থিত গীতা সাধকদের বিনম্র শুভেচ্ছা জানিয়ে এই গূঢ় অধ্যায়টির বিবেচন আরম্ভ হলো।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি অতুলনীয় পাঠ যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে। বিশেষ করে এই অধ্যায়টি মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুন্দর পথ প্রদান করে।

17.1

অর্জুন উবাচ

য়ে শাস্ত্রবিধিমুত্সৃজ্য, য়জন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেষাং(ন্) নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ,সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ||1||

অর্জুন বললেন- হে কৃষ্ণ ! যে সব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদির পূজা করেন, তাঁদের নিষ্ঠা কিরূপ ? তা সাত্ত্বিকী, না রাজসী, না তামসী ?

বিবেচন: এই অধ্যায়টি অর্জুনের প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে।

শ্রী ভগবান সমগ্র সৃষ্টিকে তার গুণের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন - দৈবী সম্পদ এবং আসুরী সম্পদ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ । ১৬.১। ভগবান এখানে দৈবী গুণসমূহের বিশদ বিবরণের পাশাপাশি আসুরী সম্পদের বর্ণনাও করেছেন। এই গুণগুলি ব্যাখ্যা করার সময়, শ্রী ভগবান মূলত এই বার্তা দিয়েছিলেন যে দৈবী গুণসমূহও নির্গুণে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আমরা যদি নিজের জীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চাই, তবে জীবনকে সদগুণে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। আমরা জীবনে উন্নতির পথে না অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হব, তা আমাদের মূল্যবোধ চয়নের ওপর নির্ভর করে।

ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন যে জীবনে কদাচিৎ যদি পথ চয়ন করা নিয়ে মনে কোনো বিভ্রান্তি থাকে, তাহলে শাস্ত্রকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নাও - **তস্মাৎ শাস্ত্রম্ প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।।** জীবনে যদি কখনো মনে এই সংশয় দেখা দেয় যে কোন সিদ্ধান্তটি শ্রেয়, তখন বৈদিক শাস্ত্রে লেখা নির্দেশকেই ভিত্তি হিসাবে মেনে নির্ণয় নিন।

এর আগেও ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রী ভগবান বলেছেন –

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥১৬.২৩॥

যে ব্যক্তি এই শাস্ত্রের বিধি নিদেশ না মেনে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের চিন্তায় প্রবুদ্ধ হয়ে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ছুটতে থাকে, সে সিদ্ধি লাভ করে না, পরমগতি এবং সুখ, কোনোটাই প্রাপ্ত করতে পারবে না।

আমাদের শাস্ত্রে লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন, উভয়ের জন্যেই নির্দেশ আছে। লৌকিক বা জাগতিক জীবন যাপন করার সময় আমরা লৌকিক বিদ্যা অধ্যয়ন করি এবং জ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা এই বিদ্যা গ্রহণ করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সকলেই পরমাণু অর্থাৎ atom সম্পর্কে শুনেছি। রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেলের নির্মাণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পারমানবিক ক্ষেত্রে(Nucleus) প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এবং ইলেকট্রন কক্ষপথে এর চারপাশে ঘোরে। এই মূল সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখলেই বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই বিষয়ে আরও গভীরে অধ্যয়ন করতে পারবে।

সেই একইপ্রকারে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মগ্রন্থের নির্মাণ করেছেন বা যা যা নির্দেশ দিয়েছেন, সেই বিদ্যার ওপর শ্রদ্ধা রেখে আগামী প্রজন্ম তাদের অনুসরণ করে। অতএব, শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রের নির্দেশ পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা বৈদিক শাস্ত্র হলো এর প্রমাণ। এই শাস্ত্র থেকে অর্জিত জ্ঞান লৌকিক বা জাগতিক জীবন যাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। করোনা মহামারীর সময় এটা প্রমাণ হয়েছে যে জীবনে নিয়ম মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক স্তরে জীবন যাপন করার সময়ও এই শাস্ত্রবিধির আচরণ করা উচিত।

কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্নটা অন্যরকম। অনেক সময় এমনটা হয় যে আমরা জীবনে একজন

পথ-প্রদর্শক খুঁজি, কিন্তু তেমন কোনো উপায় উপলব্ধ থাকে না বা গুরু পাওয়া যায় না যিনি আমাদের ঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, সেই কারণেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে, যিনি এই শাস্ত্রের বিধি-বিধান পরিত্যাগ করে নিজের অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদের পূজা করেন, তাদের নিষ্ঠাকে কোন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়? সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?

আমরা শুধুমাত্র এই শরীর নয়, অন্তঃকরণে স্থিত চৈতন্য তত্ত্বও বটে। আমরা যেমন এই দেহে অবস্থান করে জাগতিক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করি, ঠিক একইভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো জানার জন্য, আমাদের মধ্যে যে অবিনশ্বর তত্ত্বটি বিদ্যমান রয়েছে, তাকে জানার জন্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে হবে এবং পূজা-অর্চনা করতে হবে।

এইজন্যেই বলা হয় :

য়তো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ

ধর্মের রথের দুটি দিক আছে- অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স।

অভ্যুদয় অর্থাৎ আমাদের জাগতিক উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম গতি বা মঙ্গল বা আধ্যাত্মিক শান্তি।

আমাদের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মনুষ্যের জীবন অভ্যুদয়ের মাধ্যমেও পরিপূর্ণ হতে পারে, তবে তা যেন নৈতিকতার পরিধির মধ্যেই থাকে যাতে শেষ পর্যন্ত আমরা আধ্যাত্মিক শান্তিও প্রাপ্ত করতে পারি।

সাধক জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ বলেন –

শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তাই মেনে চলতে হবে। যদি শাস্ত্রে লেখা থাকে যে রাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে তাহলে রাষ্ট্রকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ: মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তার একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় অপূর্ণ ছিল, তাই রাজ্যভার ওনাকে হস্তান্তর করা হয়নি কারণ রাজ্য পরিচালনার কাজে তাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। সেই কারণেই তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুকে রাজা ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু এই নির্ণয়ে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু শাস্ত্র অনুসারে সেটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ আরও বলেন, শাস্ত্রের নির্দেশানুসার যদি বিষও গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সেই নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে যা তার অনন্য প্রমাণ। তাঁর পিতা বিট্ঠল পন্ত এবং মাতা রুক্মিণী বাই ছিলেন। মা রুক্মিণী দেবীর সাথে বিঠল পন্তের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিল না। বিট্ঠল পন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কিন্তু কয়েক বছর পর তার স্ত্রী রুক্মিণীর কঠোর তপস্যার কারণে তাকে পুনরায় পারিবারিক জীবনে ফিরে আসতে হয়। তাঁর গুরুর অনুমতিক্রমে তিনি পুনরায় গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেন এবং আলান্দিতে(মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় স্থিত একটি স্থান) চারজন অভূতপূর্ব শিশু সন্তানের জন্ম হয় - সোপন, জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ এবং মুক্তাবাই।

একজন সন্ন্যাসীর সন্তান কিরূপে সামাজিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত করতে পারে, তা সমাধান শাস্ত্রগ্রন্থে কোথাও লেখা নেই। তাই সেখানকার ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করেন। তাকে চরম যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তার সন্তানদের উপনয়নের অনুমতিও দেওয়া হয়নি, তাই তিনি যখন তাদের অধিকারের দাবিতে ধর্মসভায় যান, তখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

তিনি অত্যন্ত ধার্মিক জীবন যাপন করেছেন এবং তিনি সেই সন্তানদের পিতা-মাতা যাদের মধ্যে নিবৃত্তিনাথ ছিলেন ভগবান শিবের রূপ, জ্ঞানেশ্বর জী ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর রূপ, সোপান ছিলেন ভগবান ব্রহ্মার রূপ এবং মুক্তাবাই হলেন আদি মাতার স্বরূপ। তথাপি তিনি শাস্ত্রের বিধান পালন হেতু মৃত্যুবরণ করে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন এবং জলে নিজের দেহ সমর্পণ করেন।

এখানে অর্জুনের প্রশ্ন মধ্যম শ্রেণীর, শাস্ত্রের বিধান অনুপস্থিত কিন্তু শ্রদ্ধা আছে। যদি শাস্ত্রবিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হয় তবে তা উত্তম শ্রেণীর, কিন্তু যেখানে শাস্ত্রের বিধান এবং শ্রদ্ধা, দুইই অনুপস্থিত, সেটা হলো নিম্ন শ্রেণীর।

আমাদের সমাজে শ্রদ্ধার গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধা নিয়েই নিরন্তর চর্চা চলতে থাকে; যার কারণে আমাদের মূল্যবোধের ভিতের ওপরই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। মূলত আমরা পিতামাতা এবং শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হলে তাকে **Faith** বলে, belief নয়, কারণ মানুষ শুধু একটা শরীর নয়, আবার শুধুমাত্র বুদ্ধিও নয়, মানুষ হলো সেই মন যাতে আবেগের আধিপত্য আছে। আমাদের জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে - আমরা শারীরিক স্তরে জীবন অতিবাহিত করি, আমরা সক্রিয় হই, আমরা বুদ্ধির স্তরে জীবনযাপন করি যেখানে বুদ্ধি তর্ক করে, নির্ণয় নেয়, যাকে যুক্তি(reasoning) বলা হয়। কিন্তু

যখন আমরা মনের স্তরে থাকি তখন আবেগ প্রবল থাকে, তাকে emotions বলে। মন আর বুদ্ধির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই, মন ভালোবাসে, মনে আবেগের আধিপত্য থাকে কিন্তু বুদ্ধি তর্ক করে কারণ যার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সে মনের কথা শোনে না। কিন্তু যার মন কোমল ও আবেগপ্রবণ সে বুদ্ধির কথা মানে না। বেশিরভাগই বুদ্ধি ও মনের পথ একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়।

জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ একেই যোগ বলে অভিহিত করেছেন এবং যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - যখন মন এবং বুদ্ধি একই ছন্দে একত্রিত হয়ে যায়, তখন মন ভালোবাসে এবং বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে যে মন কেন ভালবাসে, অর্থাৎ দুটি বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তোলা। মানুষ শ্রদ্ধা এবং ভাবের বশীভূত হয়।

সেই জন্যেই অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেন যে এই ধরনের মানুষের ভক্তি কোন শ্রেণীর - সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক?

17.2

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা, দেহিনাং(ম্) সা স্বভাবজা
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব ,তামসী চেতি তাং (ম্) শৃণু

শ্রীভগবান বললেন—মানুষের স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয়ে থাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। সেগুলি বিস্তারিতভাবে আমার কাছে শোন।

বিবেচন: শ্রী ভগবান নিষ্ঠা সম্পর্কে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রদ্ধা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শ্রদ্ধার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হল নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা যখন দৃঢ় ও প্রগাঢ় হয়, তখন নিষ্ঠায় পরিণত হয়। নিষ্ঠার মূলে শ্রদ্ধা অপরিহার্য। আমাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে নিষ্ঠায় পরিণত হয়ে যায়, সেজন্যেই আমরা নিজের সমগ্র জীবন গুরুর চরণে সমর্পিত করতে সক্ষম হই।

শ্রী ভগবান বলেছেন যে একজন দেহধারী মানুষের মনে যে শ্রদ্ধাভাব আছে তা হলো স্বভাবগত এবং ত্রিবিধ(তিন প্রকার)।

শ্রী ভগবান বুদ্ধির বিরোধী নন, কিন্তু শ্রদ্ধার প্রতি আগ্রহী।

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪.৩৯।

শ্রী ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন যে, জ্ঞান সেই ব্যক্তিই প্রাপ্ত করেন যার অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে।

এই সত্যটি যদি আমরা যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে অনেক বুদ্ধিজীবীও তা মেনে নিতে পারবেন। যখন আমরা বিজ্ঞানের ক্লাসে একটি পরমাণুর(Atom) গঠন বা জ্যামিতি ক্লাসে একটি বিন্দুর(Point) সংজ্ঞা শিখি, তখন শিক্ষক তা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে একটি বিন্দু আঁকেন কারণ যদি শিক্ষার্থী সেটা না দেখে তাহলে সে তা বিশ্বাসই করবে না এবং তাহলে পরবর্তী পরিচ্ছেদ তারা শিখতেই পারবে না। একইভাবে অধ্যাত্মের পথে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন। গুরুর বাণী, শাস্ত্র, মুনি -ঋষি এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋষি-মুনিদের মেধা ও জ্ঞানের ফলশ্রুত যে সমস্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যা তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের (Cosmic)তরঙ্গের মাধ্যমে পেয়েছিলেন এবং তা পাঠোদ্ধার(decoding) করে আমাদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার- অর্থাৎ বেদ উপলব্ধ করিয়েছিলেন।

গুরুদেব শ্রী গোবিন্দদেব গিরিজী মহারাজ বলেন, আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেন অন্ধ না হয়, যেন ত্রিনেত্র শ্রদ্ধা

হয়। আমাদের দুই চোখ হলো চর্মচক্ষু অর্থাৎ যা দ্বারা আমরা জাগতিক জ্ঞান অর্জন করি এবং তৃতীয় চোখ যা ভ্রুর মাঝখানে অবস্থিত সেটি হলো জ্ঞান চক্ষু, সেটিই হলো ঋষিদের নেত্র(ত্রিনেত্র)। গুরুদেব আরও বলেছেন যে যদি আমরা ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস রাখি, তাহলেই আমরা নিজের জীবনকে সুন্দর করতে সক্ষম হব। আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা বা তত্ত্ব আছে যার ভিত্তি যুক্তির উপর নির্ভর করে না। যুক্তির মাধ্যমে বুদ্ধি কতটা সূক্ষ্ম, তা বোঝা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রতিটি কর্মের মূল্যায়ন করা যায়।

গুরুদেব বলেছেন – **শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।** সত্য কেবল শ্রদ্ধার মাধ্যমেই প্রাপ্ত করা যায়।

একজন দার্শনিক এফ এইচ ব্র্যাডলি (ইংরেজি দার্শনিক) তো এটাও বলেছিলেন "(If you want to know the truth, intellect must commit suicide.') অর্থাৎ অনুভবের মাধ্যমেই সত্যকে প্রাপ্ত করা যায়। বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে কারণ আমরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে এটা প্রমাণ করতে পারবো না যে আমরা কেন পিতামাতা এবং শিক্ষকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করি? শ্রদ্ধা আবেগের বিষয়, বুদ্ধির নয়।

তাই শ্রী ভগবান এখানে বলেছেন যে শ্রদ্ধা স্বভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং স্বভাব প্রবৃত্তি জনিত হয়। আমাদের স্বভাব, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের সংমিশ্রণ(Combination) এবংএই প্রত্যেকটি গুণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে, গঠিত হয়। সত্ত্বগুণ হল জ্ঞানের প্রকাশ, রজোগুণ হল সক্রিয়তা এবং তমোগুণ হল নিষ্ক্রিয়তা। এই তিনটি গুণই জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যখন রাস্তায় গাড়ি চলে তখন পেট্রোল হলো রজোগুণ, স্টিয়ারিং হলো সত্ত্বগুণ এবং ব্রেক তমোগুণ। এই তিনটি ছাড়া গাড়ি চলতে পারে না। একইভাবে জীবনে এই তিনটি গুণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এদের মাত্রা পরিবর্তনশীল, যা তাদের স্বভাবের ভিত্তি তৈরি করে।

সাধক জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ বলেছেন - সাত্ত্বিক ব্যক্তির অন্তঃকরণে সর্বদা এই ভাব থাকে যে তার জীবন অন্যের কল্যাণে সমর্পিত। যার মনে এই নিঃস্বার্থভাব থাকে - সেই ব্যক্তি কোন ধরনের খ্যাতি, যশ বা পুরস্কারের আশা করে না; সে তার সমস্ত কাজ বিশ্বজগতের কল্যাণে সমর্পিত করে দেয়।

রাজসিক প্রবৃত্তির মনোভাব এই প্রকার হয়, যেমন - কেউ যেন আমার থেকে এগিয়ে না যায়। রজোগুণ আমাদের সারাজীবন সক্রিয় রাখে, কেউ যদি তার থেকে এগিয়ে যায়, তাহলে মনের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব প্রবল ভাবে জেগে ওঠে।

অতএব, আমাদের স্বভাব এবং প্রবৃত্তি দুইই এই গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হবে। আমাদের প্রবৃত্তি হবে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তি, তাই শ্রী ভগবানও আমাদের শ্রদ্ধাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আমাদের স্বভাব আংশিক ভাবে বংশগত এবং বাকিটা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণে একই পরিবেশে বড় হলেও একই মায়ের তিন সন্তানের স্বভাব ভিন্ন হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করে স্বভাবের মূল্যায়ন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ : পিতা তিনজন সন্তানকে উপহার হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। তারা এই টাকা কিসে খরচ করবে সেটা তাদের স্বভাবের ওপর নির্ভর করবে। স্বাত্তিক স্বভাবের সন্তান সেই টাকা দিয়ে কিছু বই কিনবে বা কাউকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করবে। যে সন্তানটি রাজসিক স্বভাবের, সে নিজের আনন্দ-ফুর্তির জন্য টাকাটা খরচ করবে এবং তামসিক স্বভাবের সন্তান কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য সেই টাকা ব্যবহার করতে পারে, তাই তাদের প্রতিক্রিয়া তাদের স্বভাবের উপর নির্ভর করে।

সাধক জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ বলেছেন - মানুষের মনে প্রবৃত্তি অনুসারে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলি নির্মিত হয়, যার ভিত্তিতে কর্ম নির্ধারণ হয় এবং সেই অনুযায়ী সেই ব্যক্তি পরবর্তী জন্ম নেয় এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

অতএব, এই অধ্যায়টি আমাদের স্বয়ংকে পরীক্ষা করার জন্য একটি মাপকাঠি প্রদান করে যার মাধ্যমে আমরা

নিজেদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে চিনে নিতে পারি।

17.3

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য , শ্রদ্ধা ভবতি ভারত
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং(ম্) পুরুষো ,য়ো য়চ্ছ্রদ্ধঃ(স্), স এব সঃ

হে ভারত! সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তার অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত, সেটিই তার স্বরূপ অর্থাৎ সেটিই তার নিষ্ঠা—স্থিতি।

বিবেচন: হে ভারত, এখন তুমি জ্ঞানের আভায় আলোকিত হয়ে উঠেছো, তাই জ্ঞানের প্রতি তোমার জিজ্ঞাসা উদ্রেক হচ্ছে। প্রত্যেকের মনের শ্রদ্ধা ভাব তাদের অন্তঃকরণের চিন্তাধারা অনুযায়ী হয়। প্রতিটি মানুষের মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এমনটা নয় যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ওপর শ্রদ্ধা থাকবে, কারো মনে তার পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, আবার কারো মনে তার গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, অনেকে আবার তাদের নেতাকে শ্রদ্ধা করে।

17.4

য়জন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্,য়ক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ
প্রেতান্ভূতগণাংশ্চান্যে,য়জন্তে তামসা জনাঃ

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসাদির পূজা করেন আর তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতের পূজা করে থাকেন।

বিবেচন: সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত ও প্রেতাত্মাদের পূজা করে।

যদি বর্তমান সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যে রাজসী ব্যক্তি, সে মানুষকেই সর্বোত্তম মনে করে এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে তাদেরই পূজা করে। জীবনে যারা ভুল পথে চালিত হয়, তাদের মধ্যেও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তামসিক প্রবৃত্তির হয়।

রাজসী প্রবৃত্তির মানুষ নেতা এবং মন্ত্রীদের শ্রদ্ধা করে এবং নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য তাদের প্রশংসা-স্তুতি করে।

17.5

অশাস্ত্রবিহিতং(ঙ) ঘোরং(ন্), তপ্যন্তে য়ে তপো জনাঃ
দম্ভাহংকারসংয়ুক্তাঃ(খ্) ,কামরাগবলান্বিতাঃ

দম্ভ, অহংকার, ভোগ ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত যে সকল ব্যক্তি শরীরই পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্তর্যামীরূপে স্থিত আমাকে ক্লেশ প্রদান করে, কঠোর তপস্যা করে; সেই মূঢ় ব্যক্তিদের তুমি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে জানবে।

বিবেচন: শ্রীভগবান এখানে আমাদের স্বয়ংকে এবং অন্যদের চেনার দৃষ্টি প্রদান করেছেন। নিজের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী আমরা নিজের স্বভাব বিচার করতে পারি।

ধরুন, কেউ যদি রাস্তায় ধারে দুই হাজার টাকা পড়ে থাকতে দেখেন, সেটা তিনি কিভাবে ব্যবহার করবেন তা তার প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে।

যদি তিনি মনে করেন যে এই অর্থ তার নয়, সুতরাং টাকাটা মন্দিরে দান করা বা অন্য কোনও ভাল কাজে ব্যবহার করা উচিত, তবে এটি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি।

একই পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তি যদি মনে করে যে যখন এই টাকা আমার নয়, তখন মাটিতেই পড়ে থাকুক এবং তৃতীয় ব্যক্তি যদি মনে করে যে এটি যখন এমনিই পড়ে আছে, তাহলে আমার নিজের জন্যই এই টাকা ব্যয় করা উচিত, তবে ক্রমানুযায়ী এটি রাজসিক এবং তামসিক প্রবৃত্তি।

শ্রীভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন, যিনি শাস্ত্রবিহীন কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে জীবনযাপন করেন, সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাবের প্রকৃতি যাচাই করতে হবে।

কিছু লোক কঠোর তপস্যা করে কিন্তু তারা কেন তা করছে সে বিষয়ে আমাদের জেনে নিতে হবে। যারা দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শনের জন্য তপস্যা করে বা যাদের মনে কামনা, আসক্তি ও অহংকার সর্বোপরি থাকে, তাদের তপস্যাকেও যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে এবং বুঝতে হবে।

প্রতিটি তপস্যা বা সাধনা যা জগতের কল্যাণের জন্য অথবা নিজের স্বার্থের জন্য করা হয়, তার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে।

সাধক জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ বলেছেন- যে তপস্যা লোক দেখানোর জন্য করা হয় বা অন্যকে বশ বা প্রভাবিত করতে বা সংবাদপত্রের শিরোনামে আসার জন্য,করা হয় তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

17.6

কর্ষয়ন্তঃ(শ্) শরীরস্থং(ম্), ভূতগ্রামমচেতসঃ
মাং (ঞ) চৈবান্তঃ(শ্)শরীরস্থং(ন্),তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান

দম্ভ, অহংকার, ভোগ ও আসক্তিযুক্ত এবং বলগর্বিত যে সকল ব্যক্তি শরীরই পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীর এবং অন্তর্যামীরূপে স্থিত আমাকে ক্লেশ প্রদান করে, কঠোর তপস্যা করে; সেই মূঢ় ব্যক্তিদের তুমি আসুরী-সম্পদবিশিষ্ট বলে জানবে।

বিবেচন: শ্রী ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদের আসুরী প্রবৃত্তি থাকে। তারা অন্তঃকরণে স্থিত পরমাত্মাকে ক্লেশ প্রদান করে, কষ্ট দেয়। তাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, তারা জানে না জীবনে কি করতে হবে। তপস্যা, উপবাস ও ব্রত করে নিজের শরীরকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়া অন্যায়।

সাধু-মহাত্মাগণ বলেন : **"কায়া হী পংঢরী, আত্মা হা বিঠ্ঠল"।**

অর্থাৎ: আমাদের এই শরীর যেন ভগবানের মন্দির হয়ে যায়, কারণ ভগবান তো প্রতিটি জীবের অন্তরেই বিরাজমান থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান নিজের পরিচয় দিয়েছেন -

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ । ১৫.১৫।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ । ১৫.৭।

সৃষ্টির সকল জীব আমারই অংশ। শ্রীভগবান কোথাও জাতি ও ধর্ম অনুসারে কোনো বিভেদ করেননি, এমনকি

তিনি কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের সীমানাও উল্লেখ করেননি।

যারা শাস্ত্র-বিধি না মেনে কঠোর তপস্যা করে, তারা ভগবানকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয়।

17.7

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ,ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ
য়জ্ঞস্তপস্তথা দানং (ন্),তেষাং (ম্) ভেদমিমং(ম্)শৃণু

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকারের হয়; তেমনিই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাও তিন প্রকারের হয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের হয়, তুমি তার প্রভেদগুলি শোন।

বিবেচন: সাধারণতঃ আমরা নিজেদের জীবনযাপন চারটি স্তরে করে থাকি - শারীরিক স্তর, মানসিক স্তর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্তর, কিন্তু পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি হলো - আত্ম স্তর, সেটি আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই।

চারটি স্তরে জীবনযাপন করুন এবং বুদ্ধির উন্নয়ন এবং শরীরের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যায়াম করুন।

এখানে শ্রী ভগবান আমাদের সুস্থ থাকার জন্য খাদ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেছেন। আহার আমাদের স্বাস্থ্যের কেন্দ্রবিন্দু।

আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান –আমাদের জীবনযাত্রায় এই চারটি স্তর আছে এবং এগুলিকেও গুণ অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা এমন একটি অতুলনীয় গ্রন্থ যেখানে শ্রীভগবান সমাধির বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করেছেন আবার আহারের বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও করেছেন। অতএব, এটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের স্তরের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক স্তরেরও উন্নতি সাধন করে।

আহার তিন প্রকারের হয় -সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এবং তা তিন প্রকারের মানুষের নিজের নিজের স্বভাব অনুযায়ী প্রিয়।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও তিন প্রকারের।

আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে একশ বছর বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া আছে, তাই ব্যবহারিক স্তরে, সুস্থ থাকতে এবং দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার জন্য, শ্রী ভগবান এখানে সঠিক আহারের বিবরণ দিয়েছেন।

জীবেত শরদঃ শতম্।।

17.8

আয়ুঃ(স্)সত্ত্ববলারোগ্য,সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ
রস্যাঃ(স্)স্নিগ্ধাঃ (স্)স্থিরা হৃদ্যা , আহারাঃ(স্)সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ

আয়ু, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ, চিত্তপ্রসন্নতা বৃদ্ধিকারী এবং পুষ্টিকর, হৃদয়ে শক্তিবর্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ এরূপ আহার্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

বিবেচন: যে খাদ্য আমাদের শক্তি, আয়ু, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে এবং যা সুখ ও শান্তি প্রদান করে এবং প্রীতিভাব বৃদ্ধি

করে তাকে সাত্ত্বিক আহার বলে।

১. **রসযুক্ত** - খাঁটি গরুর দুধের ঘি দিয়ে তৈরি খাবার এবং দুধ, দই, ফলের রস এবং সবুজ শাকসবজি যুক্ত খাদ্য।
২. **স্নিগ্ধ**- অর্থাৎ মসৃণ পদার্থ,
৩. যে পদার্থ হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং শরীর ও মনের অস্থিরতাকে স্থির করে,
৪. একটি সুখকারী খাদ্য যা শরীরকে পুষ্ট করে এবং সুস্থ রাখে,

এই ধরনের খাদ্য সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষদের প্রিয়।

জ্ঞানেশ্বরীতে এর সুন্দর বর্ণনা আছে-

জৈসে গুরুমুখী চে অক্षর, অল্প পরী বহু হিতকর।
তৈসে তৃপ্তি করী জে অপার, অল্পমাত্র সেবনে।।

সদগুরুর আশ্রয়ে এলে তিনি আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত মন্ত্র দেন, যা ছোট হলেও অত্যন্ত হিতকারী, একইপ্রকারে যে খাবার স্বল্প পরিমাণে খেয়েই তৃপ্তি হয়, মন শান্ত হয় এবং স্থির হয়, সেই আহারকে সাত্ত্বিক আহার বলে।

17.9

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ,তীক্ষ্ণরূক্षবিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা, দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥9॥

অত্যন্ত কটু, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকারক আহার বা ভোজ্যপদার্থ রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়, যা দুঃখ-শোক এবং রোগ উৎপন্নকারী।

বিবেচন: এই প্রকার আহার রাজসিক প্রবৃত্তির মানুষের প্রিয়। এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে যে, এমন নয় যে এই খাবারটি আমাদের কখনই খাওয়া উচিত নয়। আপনি কোন খাদ্য কি পরিমাণে এবং কোন সময়ে গ্রহণ করবেন, সেই সম্পর্কে বিচার ভাবনা করুন।

যে খাবার খুব ঝাল মশলাযুক্ত, খুব টক যা অ্যাসিডিটি বাড়ায়, খুব নোনতা, খুব দাহকারী বা গরম, শুকনো (আলুর ভুজিয়া, নিমকি ইত্যাদি),

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ য়ত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥18.38॥

এই দাহকারী খাবারগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু, কিন্তু এগুলোর ফলাফল আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ এবং বেদনাদায়ক।

জ্ঞানেশ্বরীতে খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

আধীंच द्रव्यें चुरमुरीं | वरी परवडिजती मोहरी |

जियें घेतां होती धुवारी | नाकेंतोंडें ||१४६||

যে খাবারে সরিষার দানা থাকে, যে খাবারের স্বাদ অত্যন্ত ঝাঁঝালো হয় বা যে খাবার খেলে নাক ও মুখ থেকে জল বের হতে থাকে, এই প্রকার রাজসিক আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, অম্লীয়মূলক হয়।

17.10

য়াতয়ামং (ঙ্) গতরসং (ম্), পূতি পর্য়ুষিতং (ঞ্) চ য়ত
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং (ম্), ভোজনং(ন্), তামসপ্রিয়ম্ ॥10॥

যে খাদ্য রসবর্জিত, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট এবং অত্যন্ত অপবিত্র (মাংসাদি বস্তু) তথাপি তামস ব্যক্তিগণের সেরূপ খাদ্যই প্রিয় হয়।

বিবেচন: অসিদ্ধ রান্না, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি খাবার, অশুদ্ধ আমিষ খাবার এবং অপরের উচ্ছিষ্ট খাবারই তামসিক প্রবৃত্তির মানুষের প্রিয়।

যখন স্বামী বিবেকানন্দ সাধনা প্রারম্ভ করেন, তখন তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে স্বয়ং নিজের রান্না করে খাওয়ার আজ্ঞা দিয়েছিলেন। এই নিয়মটি আবশ্যক যাতে সাধনায় কোনো বিঘ্ন না আসে।

পর্য়ুষিত বা বাসি খাবার কী?

আয়ুর্বেদের অনুসারে আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা লবণ যুক্ত খাবারকে বাসি বলা হয়।
পেঁয়াজ-রসুন যুক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাবারকে পর্য়ুষিত বলা হয়।

আসাম প্রদেশে এমন অনেক জাতি আছে যারা বাসি খাবার খায়, পচা ভাত দিয়ে তৈরী মদ খায় এবং নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, এরা তামসিক খাবার পছন্দ করে।

সাধক জ্ঞানেশ্বর জী তামসিক আহারের খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন-

अन्न सकाळचे तीसर्या प्रहरी,
आज रात्रि चे उद्या दुपारी,
ऐसी शिळ्या अन्ना ची आवड़ भारी,
तामसी लोकांना।
ऐसे तामसी भक्षण, जे न तत्वता भोजन,
ते तो पोटी घातले मरण यातनांचे।।

অর্থাৎ: যে খাবার সকালে তৈরি করা হয়েছে, সেটা বিকালে খাওয়া, আবার যে খাবার রাত্রিতে তৈরি হয়েছে, সেটা পরের দিন খাওয়া, এই প্রকারের বাসি আহার তামসিক প্রবৃত্তির মানুষ খেতে পছন্দ করে। এই ধরনের খাবারের কারণে শরীরে যাতনার উদ্রেক হয়। শরীর তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জীবন বোঝা সমান হয়ে যায়।

শ্রী শঙ্করাচার্য জী মহারাজ বলেছেন যে আহার শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ করা হয় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও গ্রহণ করা যেতে পারে। শব্দ কানের আহার, রূপ চোখের আহার, গন্ধ নাকের আহার, জিহ্বার আহার হলো স্বাদ এবং স্পর্শ হলো ত্বকের আহার।

আমরা চোখ দিয়ে কী দেখতে চাই, নাক দিয়ে কী গন্ধ নিতে চাই, কান দিয়ে কী শুনতে চাই, কেমন স্পর্শ চাই, এসব নিয়ে বিচার করাও আবশ্যক কারণ এগুলো মনের ওপর প্রভাব ফেলে।

শরীর ও মন, আহার উভয়ের জন্যই অপরিহার্য, **जैसा अन्न वैसा मन,** অর্থাৎ :যেমন অন্ন, তেমন মন।

17.11

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো, বিধিদৃষ্টো য় ইজ্যতে
য়ষ্টব্যমেবেতি মনঃ(স্),সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ

যজ্ঞ করা উচিত' –এইরূপ কর্তব্য মনে করেই ফলেচ্ছা ত্যাগকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

বিবেচন: যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমর্পণের ভাব থাকে এবং এটি সকলের কল্যাণের জন্যেই করা হয়।

সংগঠিতভাবে যা করা হয় তা হল যজ্ঞ, যজ্ঞের মাধ্যমেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড একটি সংগঠিত রূপেই চলে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রী ভগবান যজ্ঞের সংজ্ঞা দিয়েছেন-

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।।৩.১০।।

পরস্পর একে অন্যের উন্নতির সোপান হয়ে জীবন যাপন করুন। সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করেই পরিপূর্ণ জীবনযাপন করা যায়, তাই গীতার এই মহাযজ্ঞে প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আহুতি অর্পণ করে। এই ধরনের সংগঠিত কাজকেও তিনটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

শাস্ত্রের নিয়ম মেনে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, যা মনকে তৃপ্তি দেয় এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই করা হয় তাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলে।

মনুষ্যজন্ম নিলে যে যে ঋণ থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ঋষি ঋণ। পুরাণকালে ঋষিগণেরা যে ধর্ম -শাস্ত্র লিখেছিলেন, সেটাই মনুষ্যজীবনের ঋষি ঋণের শ্রেণীতে পড়ে। যে প্রকার মহাভারত আছে, রামায়ণ আছে, এ সবই আমাদের ঋষি ঋণ। ঋষিদের ঋণের কারণেই আজ আমরা গীতা পাঠ করছি। পিতৃ ঋণ হলো পিতৃপুরুষদের প্রতি আমাদের ঋণ কারণ তারা আমাদের লালন-পালন করেছেন আর আমাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে রেখেছেন এবং একটি হলো সমাজের ঋণ - রাস্তা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আছে:

একবার এক নব্বই বছরের ব্যক্তি আম গাছের বীজ পুঁতছিলেন। কয়েকটি ছেলে তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এই আমগাছের ফল ভোগ করতে পারবেন? তখন সেই বয়স্ক লোকটি খুব সুন্দর উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমি যত ফল খেয়েছি, সেই ফলের গাছগুলোও তো কেউ আমার জন্য লাগিয়েছিল।

তাই সমাজের উন্নয়নের পথে আনন্দের সাথে যোগদান করা হলো সাত্ত্বিক যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়া। কর্তব্য পালনের অভিপ্রায় নিয়ে যজ্ঞ করতে হবে।

17.12

অভিসংধায় তু ফলং (ন্),দম্ভার্থমপি চৈব য়ত
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ, তং(ম্) য়জ্ঞং (ম্)বিদ্ধি রাজসম্

কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! (যে যজ্ঞ) ফলের আশা নিয়ে অথবা দম্ভ সহকারে (লোক দেখাবার জন্য) করা হয়, তাকে তুমি রাজসিক বলে জানবে।

বিবেচন: শ্রী ভগবান বলেন-যদি ফল প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করা হয় এবং লোক দেখানোর জন্য তা করা হয়, তবে একে রাজসী যজ্ঞ বলেই জানবেন। যে অভিপ্রায় নিয়ে যজ্ঞ করা হয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানেশ্বর জী মহারাজ বলেছেন -

নিজের বাড়িতে রাজাকে নিমন্ত্রণ করা যাতে খ্যাতি বৃদ্ধি পায় বা সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, এই কামনা হেতু করা যজ্ঞ হলো রাজসী যজ্ঞ।

17.13

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং(ম্),মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্
শ্রদ্ধাবিরহিতং (ম্)য়জ্ঞং(ন্),তামসং (ম্)পরিচক্ষতে

শাস্ত্রবিধিরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাবর্জিত যেসব যজ্ঞ হয়, তাকে বলে তামসিক যজ্ঞ।

বিবেচন: শাস্ত্র বিধি না মেনে যজ্ঞ, মন্ত্রহীন, বিনা দক্ষিণা, শ্রদ্ধা বিহীন যজ্ঞ হলো তামসিক যজ্ঞ।

এইভাবে এই অধ্যায়ের বিবেচন সত্র সমাপ্ত হলো।

::প্রশ্নোত্তর পর্ব::

প্রশ্নকর্তা: গোপাল জী
প্রশ্ন: আমরা যে শুকনো জলখাবার খাই- চিনে বাদাম, চিঁড়ে দই, মুড়ি ইত্যাদি, এগুলো সাত্বিক নাকি রাজসিক?
উত্তর: এগুলোকে সাত্বিক আহার বলা হয় কারণ এটা সহজেই হজম হয় এবং স্বাস্থ্যের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলে না।

প্রশ্নকর্তা: রাকেশ জী
প্রশ্ন; তামসিক কাজকেও কেন যজ্ঞ বলা হয়?
উত্তর: সংগঠিতভাবে করা কাজকে যজ্ঞ বলে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক যজ্ঞ একই রকম মনে হয় কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সাত্ত্বিক যজ্ঞ সমাজের কল্যাণের জন্য করা হয় কিন্তু রাজসিক যজ্ঞগুলি সমাজের কল্যাণের পাশাপাশি নিজের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে করা হয়। তামসিক যজ্ঞ শুধুমাত্র বিনাশের জন্য করা হয়।

প্রশ্নকর্তা: মমতা জী
প্রশ্ন: একাদশ শ্লোকে কি বলা হয়েছে দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।
উত্তর: ফলের আশা করবেন না। কর্তব্য পালনের জন্য কর্ম সম্পাদন করা, যা মনকে তৃপ্তি দেয়, যা শান্তি প্রদান করে, তা হল সাত্ত্বিক।

প্রশ্নকর্তা: দিলীপ জী
প্রশ্ন: নবম শ্লোকে বিদাহিনের অর্থ কী?
উত্তর: বিদাহিন অর্থাৎ দাহকারী, যা উত্তাপ উদ্রেক করে, দহন করে।

প্রশ্নকর্তা: রোহন জী
প্রশ্ন: স্বভাব জন্মগতভাবে অর্জিত হয়, এটা কি বদলানো সম্ভব?
উত্তর: স্বভাব জন্ম থেকে প্রাপ্ত হয়, যাকে বংশগত বা জেনেটিক বলা হয়, কিন্তু তার অতিরিক্ত পরিবেশ ও দৃষ্টিকোণও স্বভাবকে প্রভাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ :একজন রাজসিক প্রবৃত্তির ব্যক্তির কাছে যদি অন্যের আচরণ নিজের পছন্দ অনুসারে না হয় তবে

তিনি ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলেন, তবে যদি তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য অন্তর থেকে দুঃখিত হন, তাহলে তিনি নিজের স্বভাব পরিবর্তন করার প্রয়াস করবেন। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা অন্য ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন করতে পারবো না এবং সেই ব্যক্তির স্বভাবকে আমরা স্বীকার করে নিই, তখন আমাদের নিজের ক্রোধ ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে শুরু করে।

শ্রী চিন্ময়ানন্দ জীর এই বক্তব্যটি বিবেচ্য এবং পরিবর্তনের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

Yesterday I was clever, I tried to change the world.
Today I am wise, I am changing myself.

- :: ওম শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু :: -

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||